খণ্ড ৫, সংখ্যা ৫-৬
Vol. 5, No. 5-6

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

জুন-অক্টোবর ২০১৬
June-October 2016

বাংলাদেশের একজন নারীর আধ্যাত্মিক জীবন

মাসাহিকো তোগাওয়া

বাউল-ফকিরদের সাধুসঙ্গে নারীর ভক্তি-সাধনা

Spiritual Life of a Bangladeshi Woman

Masahiko Togawa

Abstract

The spiritual devotees in different regions of Bangladesh and India lead a kind of majar (mausoleum)-centered sphere of austerity. What are the experiences or learning of the common people visiting majars or how majar-culture influences the life of the common people? In addition, how religious perspectives are woven in the life style of South Asian inhabitants? These are the key questions that drive this article to discuss the spiritual life of a Bangladeshi woman. It reveals how a woman goes through austerity. It included the description of a Bangladeshi rural woman's austerity by travelling across regions and becoming enlightened.

বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে মাজারকে কেন্দ্র করে সাধকেরা এক ধরনের সাধনার জগতে বসবাস করেন। মাজারে গিয়ে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ কী রকম অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা লাভ করেন বা সাধারণ মানুষের জীবনে মাজারের অবদান কী? পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের জীবনযাপনে ধর্মীয় জগৎ কীভাবে জড়িত? এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমি এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনার চেষ্টা করেছি।

পাশ্চাত্যের সাংবাদিক ও গবেষকদের মধ্যে মূলত এরকম একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় বিরোধিতা, সন্ত্রাস ও সংগ্রাম লেগেই আছে।

মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ ১৯৪০ সালের ২২শে মার্চ লাহোরে একটি বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মের ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সাহিত্য এসবই একেবারে ভিন্ন। তাই এদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বা এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করার সুসম্পর্কও গড়ে ওঠে না। মূলত চিন্তাভাবনার দিক থেকে একে অপরকে মানে না, তারা পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাই উভয়ের সভ্যতাও একেবারে আলাদা। ... জীবন নিয়ে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীও মেলে না।"

এটা ঠিক যে, হিন্দু ও মুসলমান দুটো আলাদা ধর্ম, তাদের বৈশিষ্ট্যও সম্পূর্ণ আলাদা। এদের প্রধান ধর্মীয় কৃত্য তথা মন্দিরে পূজা এবং মসজিদে নামাজ পড়ার মধ্যে যেমন কোনোরকম মিল নেই, তেমনি আবার গরুকে ঠাকুররূপে পুজো করা এবং অপরপক্ষে সেই গরুকেই কোরবানী করে বছরের সবচাইতে বড় উৎসব করা মধ্যেও অনেক পার্থক্য রয়েছে। এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা জল ও তেলের মতো। আর ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যের লোকদের মধ্যে এমন একটা সাধারণ ধারণা প্রচলিত রয়েছে।

কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ উপনিবেশ হতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পূর্বে পশ্চিবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ মিলে উভয়বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা মোটামুটি সমান ছিল। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বহুকাল ধরে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি মিলেমিশে বসবাস করাটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। অর্থাৎ একই গ্রাম

সমাজে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ পরস্পরকে সহযোগিতা করে দৈনিক জীবন অতিবাহিত করতো। সেখানে ধর্মের ভেদাভেদ থেকেও জমিদার-কৃষক, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, মালিক-মজুরি সম্পর্কের বৈষম্য অনেকসময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সাধারণত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষ মানে হিন্দু প্রধান দেশ, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে ইসলাম ধর্মের দেশ বলে পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু লোকসংস্কৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে উভয়ের সভ্যতা যে, একেবারেই আলাদা তাও ঠিক নয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক মিলও আছে।

সাধনার মাধ্যমে যিনি বুদ্ধি, জ্ঞান, বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করে সাধারণ লোকের কাছে সম্মানিত হন, সেরকম মানুষকে সাধারণত 'সাধক' বলা হয়; সেক্ষেত্রে সাধকের বৈশিষ্ট্য বলতে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের গুরুত্ব থেকেও সেই সাধকের নৈতিক সদ্‌গুণ বা আধ্যাত্মিক শক্তি কতটা কাজ করে সেটাই বড়ো কথা। বিশেষ ক্ষমতার মাধ্যমে অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তোলা বা নারীর গর্ভধারণ—এইরকম ভৌতিক উপকারের সহায়তা যিনি করতে পারেন, তিনিই সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করে ক্রমশ 'সাধক' বলে পরিচিত হন।

লালনপন্থী সাধুদের শরণডাকায় গুরু-শিষ্যের ভক্তি নিবেদন পর্ব

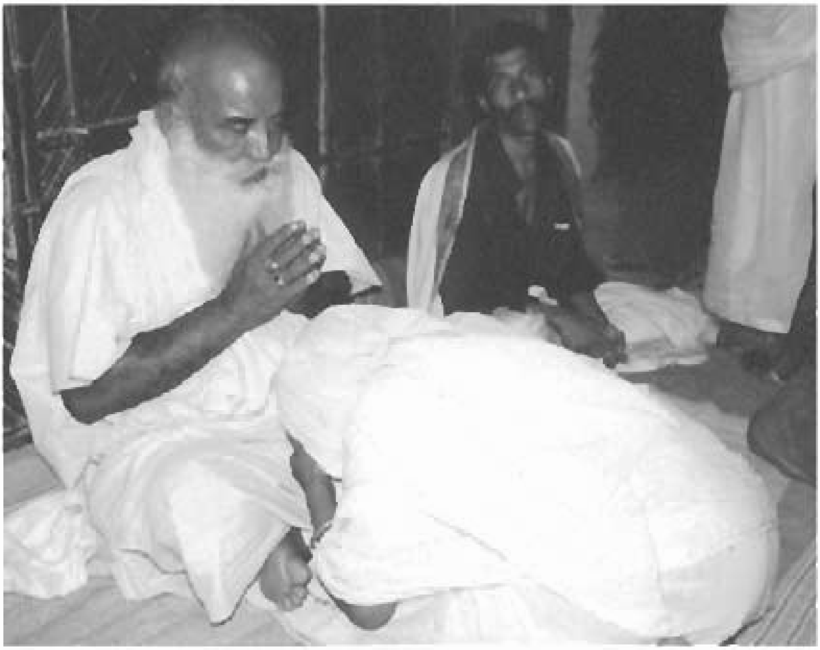

গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি নিবেদন

এখানে সাধকের বিশেষ শক্তিটাই মূল্যবান। সেটা মুসলমান সাধকের অলৌকিক শক্তি নাকি হিন্দু সাধকের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, এই ভেদ নিয়ে তখন সাধারণ মানুষ (যাঁরা কিছু অনুরোধ করেছিলেন) মাথা ঘামান না।

বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে–'পাখি এক জায়গার খাবারে তৃপ্তি না পেয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়।' অর্থাৎ মানুষ একজন গুরুর কাছে গিয়ে সন্তুষ্ট হতে না পেরে আর একজন গুরুর সন্ধান করেন, এইভাবে বিভিন্ন ধর্মের গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখা যায়। তাঁর কাছে তখন গুরু হিন্দু না মুসলমান–এই প্রশ্নের চেয়েও কোন সাধকের কাছে মানসিক তৃপ্তি পেতে পারেন বা কোন সাধকের কাছে নিজের কামনা-বাসনা ফলপ্রদ হয়–সেটা মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়।

সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে তাদের নানারকম সমস্যা বা কামনা-বাসনা পূরণে সাধকের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা কতটা ফলদান করতে পারে, আবার সাধকের বাণী কতটা ভক্তের মনের গভীরে পৌঁছাতে পারে–সেই বিষয়টা ভক্তের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক জটিলতার খবরাখবর দেখে আমার মনে সবসময় প্রশ্ন জেগেছে যে, কীরকম অদ্ভুত আকর্ষণে সাধারণ গ্রামের মানুষ সাধকের কাছে বা মাজারে যায়? কী তাদের এত টানে? সেখানে

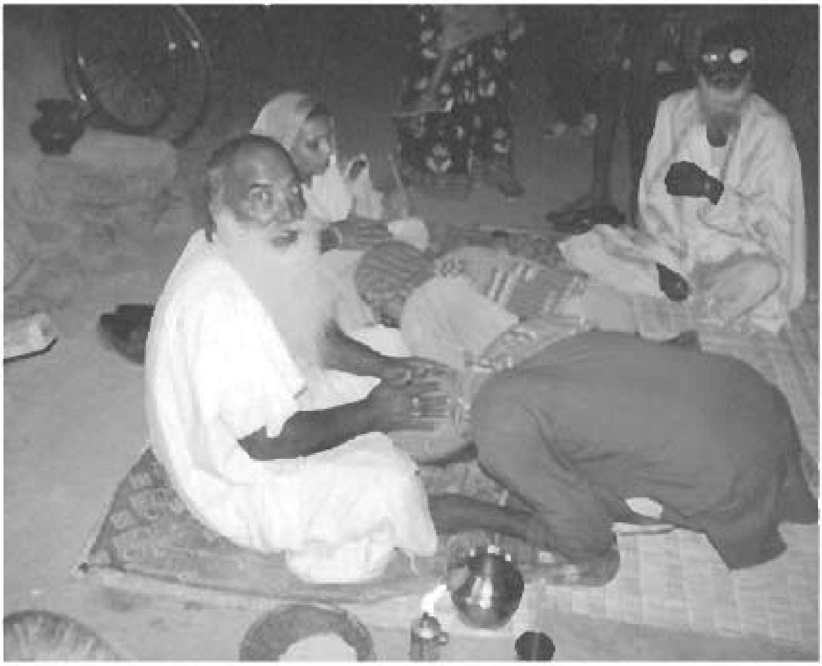

লালনপন্থী গুরু-গুরুমাকে ভক্তি নিবেদন

হিন্দু-মুসলমান–এই বাহ্যিক দ্বন্দ্ব ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে বহু বহু বছর ধরে সংস্কৃতি করে আসা মানুষের ধর্মীয় সংস্কৃতির সম্পর্কের মধ্যে গভীরতা নিহিত আছে।

অবশ্য বিশ্বের ধর্মরূপে ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম তাদের নিজ নিজ ঐতিহাসিক পটভূমি ও চিন্তাধার বহন করে। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা রাজা-প্রজাদের কৃতিত্ব, তাঁদের জীবনযাপন লিখিত ইতিহাসের মাধ্যমে জানা যায়, কিন্তু সেখানে সাধারণ মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা, কামনাবাসনা, চিন্তাভাবনা বা সুখ-দুঃখ সেই তথ্য সাধারণত লেখা থাকে না।

এখানে একজন মহিলা সাধিকার সাধনার কাহিনি তুলে ধরা যাক। তার আগে বলে রাখা ভালো যে, এটা বাংলাদেশের একটি গ্রামের মহিলার কাহিনি, তিনি মাজারে যাওয়ার কারণে সেখানে বারবার নানান অলৌকিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন এবং তিনি ক্রমশ আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধানে এগিয়ে যান। এক সময় তীর্থযাত্রার সময় সাধকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়, আর ফকির লালন সাঁই-এর মতো সাধকদের আধ্যাত্মিক দর্শন লাভ করেন। ইসলাম জগতে নারী রূপে তার সাধনার কর্ম খুবই মূল্যবান।

বাংলাদেশে মারফত বা রুহানিয়ৎ শব্দের মাধ্যমে বাঙালির জীবনে সাধক বা সাধিকারা কী রকম প্রতিক্রিয়া ফেলছে, তা দেখা যাক।

প্রথমে, এই মহিলা 'মরিয়ম বেগম' (ছদ্মনাম) কীভাবে আধ্যাত্মিক সাধনার পথে নেমেছিলেন, সেটার বর্ণনা নিম্নরূপ :

২০০৬ সালের গ্রীষ্মকালে একদিন আমি লালনের মাজারের উৎসবে যাই। তখন একটা কোণে মরিয়ম বসেছিলেন। লালন মাজারের অন্যান্য সাধক-সাধিকাদের মতো তিনিও আপাদমস্তক সাদা সাধনার পোশাকে (খিলকা) বা বেষ্টিত ছিলেন। পূজার বেদীতে মোমবাতি জ্বালিয়ে নীরবে বসেছিলেন। ওনার চেহারা অন্যান্য বাঙালি মহিলার মতোই খুবই সাধারণ ছিল।

কিন্তু একবার মুখ খুললে, ওনার মুখ থেকে চরকার সুতোর মতো গড় গড় করে কাহিনি বেরোতে লাগল। শুনতে শুনতে ওনার কাহিনির জগতে আমি ক্রমশ মগ্ন হয়ে গেলাম। সারাটা দিন তাঁর কাহিনি শুনে কখন যে রাত হলো আমার কোনো খেয়ালই ছিল না। আমি পরের দিনও তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। মরিয়ম তাঁর জীবনের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কাহিনি সম্বন্ধে এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন :

বেগমের উক্তি-১

তাহাজ্জুতের নামাজ পড়ার এমনি একটা আওয়াজ হতো—ডাক দিতো সময় নামাজের টাইম না থাকলে।

কীভাবে? কী রকম আওয়াজ?

যেমন নাম ধরে ডাক দিতো। বিল্ডিংয়ের ভিতর যেমন একটা প্রতিধ্বনি আওয়াজ হয়—ওই রকমভাবে, চিৎকার করে ডাক দিতো। ফট করে ঘুম থেকে জা'গে দেহি আমার শরীর কাঁপতেছে—কি জন্য ডাক দিলো, কোথা থেকে ডাক দিলো, কে যেন ডাক দিলো?

ঘরের ভেতরে?

ঘরের ভেতরে। তখন আমি বুঝতে পারছি। আমার সেন্স পাচ্ছিলো যে, একজন মুরব্বির কাছে গিয়ে বসতাম। উনি বলছিল। তারে দাদা ডাকতাম। তারে বলচ্ছিলাম যে, দাদা আমি তো তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে পারি না ঘুমের জন্য—কিছু কিছু সুরাও পড়তে পারি না।

তিনি বললেন—তুই পড়, তোরে ডাক দিবো।

ঠিকই ডাক দিছে।

এরকম করতে করতে পরে আস্তে আস্তে যখন আরও তথ্য জানতে পারলাম, নামাজের মাধ্যমে আরও অনেক কিছু জানতে পারলাম। এভাবে জানতে জানতে পরে শেষপর্যন্ত ৪-৫ বছর পরে যে দাদা ডাকতাম উনি ইন্তেকাল করছে। পরে আমাদের বাড়ির পাশে একটা লোক আছে—উনার কাছে কিছু

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালনপন্থী সাধুদের ভেক-খেলাফতের ভিক্ষার দৃশ্য

যখন জানতে গেলাম—তখন স্বপ্নে দেখি যে, ওই চিটাগাংয়ের যে হুজুর উনি আইসা রাতে ওর হাতে হ্যান্ডসাপ করছে, হাত মিলাইছে। তারপরে কিছু বুঝতে পারলাম যে, উনি এখানে আছেন। তারপরে উনার কাছে কিছু শিখলাম। শিখার পরে নরসিংদি আরেকটা লোক আছে—উনারে আবার আমার স্বামী আনল যে, উনার কাছে কিছু আছে, তুমি শিখতে পারো। উনার কাছ থেকে ১৪-১৫টা ১৬টা সিলার শিক্ষা করছি।

মরিয়ম প্রথম ডাক পেয়েছিলেন নামাজ পড়ার সময়। ইসলাম ধর্মে বড় মসজিদে রোজই সম্মিলিতভাবে নামাজ পড়তে দেখা যায়, সেখানে কেবলমাত্র পুরুষদের নজরে পড়ে। সাধারণত ধবধপে সাদা পাঞ্জাবি পরা দাড়িওয়ালা পুরুষেরা শ্রেণীবদ্ধভাবে নামাজে নিয়ম-মতো ওঠাবসা করেন। মহিলারা বেশীর ভাগ সময় তাদের সন্তানদের নিয়ে বাড়িতেই নামাজ পড়েন।

বর্তমান জগতের ব্যস্ত মানুষরা অনেক সময় বলে থাকেন যে, সপ্তাহে একদিন নামাজ পড়লেই যথেষ্ট, কিম্বা মনে মনে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করলে যথেষ্ট। সে তুলনায় দেখা যায় গ্রামের মহিলারা বাড়িতে বসেই নিয়মিত ধর্মীয় কর্তব্য পালন করে থাকেন। মরিয়মও এইভাবেই নিজের ঘরে একা নামাজ পড়তেন।

লালনপন্থী সাধুদের পূর্ণসেবা

সাধনসঙ্গী সাধিকার সংগীতধ্যান

মরিয়মের বর্ণনার আকর্ষণীয় দিক এই যে, তাঁর জীবনে যখন অলৌকিক ঘটনা ঘটে তখন প্রথমে তার অর্থ বুঝতে না পেরে তিনি গ্রামের মাজারে এক সাধকের কাছে উপদেশ নিতে যান।

মুসলমান সমাজে প্রত্যেকটি মসজিদে মৌলবি আর মাদ্রাসায় আরবি-ভাষার শিক্ষক থাকেন। কিন্তু গ্রামগঞ্জের মসজিদে প্রধানত পুরুষেরা নামাজ পড়তে যান বলে মহিলাদের দেখা যায় মাজারে যেতে—নামাজ পড়তে বা কোনো মানত করতে। এই মাজারকে কেন্দ্র করে গ্রামের মহিলাদের সমাবেশ হয় ও অনেক সময় নানান বিষয়ের উপর আড্ডাও জমে ওঠে।

আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন সাধকের মৃত্যুর পর তাঁদের কবরস্থানে মাজার গড়ে তোলা হয় আর এই মাজারেও অলৌকিক শক্তি বিরাজ করে বলে গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করেন, আর সেখানে গিয়ে সেবা আরাধনা করেন।

ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি মুসলমান গ্রামে মাজার দেখা যায়। অধিকাংশ গ্রামবাসী গ্রামের রক্ষাকর্তারূপে সেই মাজারকে শ্রদ্ধা করেন। সেই পুণ্যস্থানকে কেন্দ্র করে পীর ও ফকির তাঁদের ধর্মীয় সাধনা করে থাকেন। মাজারগুলোতে যে অনুষ্ঠান ও দরিদ্রদের জন্য অন্ন সেবার ব্যবস্থা হয়, সেই উপলক্ষ্যে পাড়া-প্রতিবেশী মহিলারা সেখানে সম্মিলিত হন, আর তখন তাঁরা পরস্পর গল্পের মাধ্যমে খবরাখবরের আদান প্রদান করেন। এটা তাঁদের পক্ষে ছোটখাটো গৃহস্থ সমস্যা সমাধানের কিম্বা কোনো ধর্মীয় ঘটনার আলোচনার কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

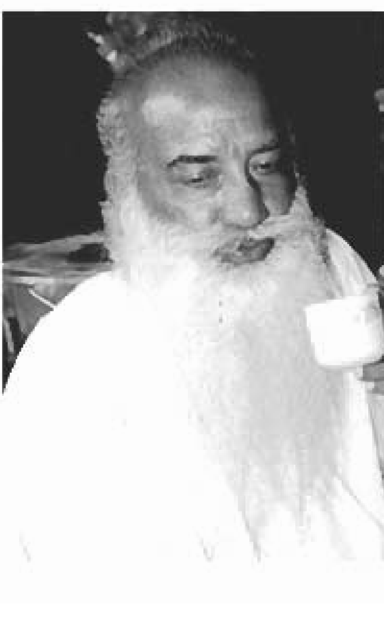
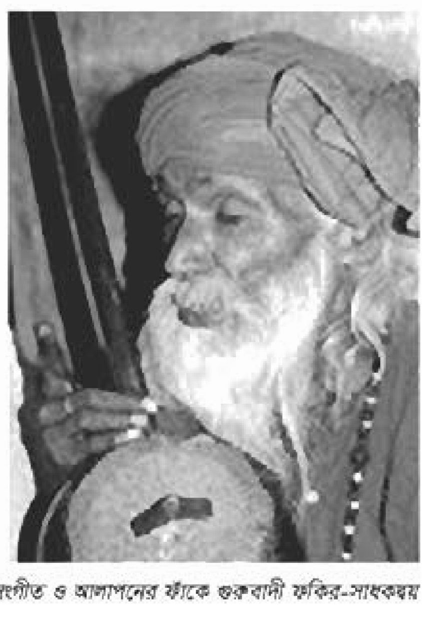

সংগীত ও আলাপনের ফাঁকে গুরুবাদী ফকির-সাধকদ্বয়

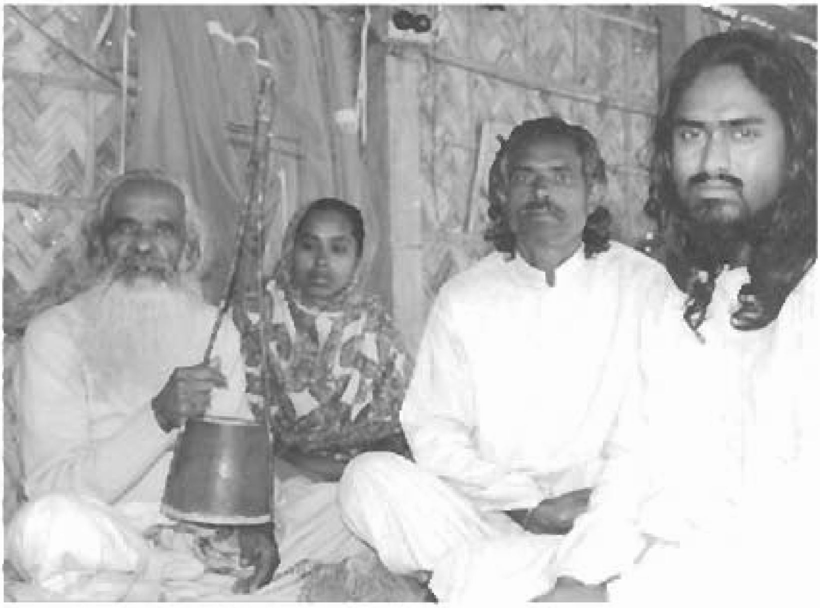

লালনপন্থী সাধকদের ঘরোয়া গানের আসর

মরিয়ম যে মাজারে পরামর্শ বা উপদেশ নিতে গিয়েছিলেন, সেটা তাঁর গ্রামের এরকমই একটা মাজার ছিল।

প্রথম অভিজ্ঞতার পর মরিয়ম তার গ্রামের মাজারের পিরের কাছে যাতায়াত শুরু করলেন, তারপর থেকে তাঁর জীবনে পরপর কিছু অলৌকিক ঘটনা/অভিজ্ঞতা ঘটতে লাগল। যেমন, চোখ ঝলসানো আলোর দ্বারা আবৃত্ত হয়ে জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা তাঁর বারবার হতে লাগল। এইরকম অভিজ্ঞতার পর মরিয়মের এই অদ্ভুত অলৌকিক জগতের প্রতি খোঁজ করার ইচ্ছা আরও প্রবল হতে লাগল।

বেগমের উক্তি-২

আমি রাত্রে গোরস্থানে গিয়া বসে থাকতাম। গোরস্থানে বসার সময় দুই দিন দেখছি—এই বড় গোটা মোটা লম্বা অগ্নিকুণ্ড আকাশ থেইকা আগুনের মতো লম্বা হইয়া গম করে নামছে কবরস্থানে। একটা বিরাট আলো, যতটুকু চোখ যায় সব উজ্জ্বল হয়ে গেছে, ফস্যা হয়ে গেছে। বলতে বলতে যেমন ৫ মিনিট গেছে, নাই, মুছে গেছে আবার। যখন সাধনায় কবরস্থানে যাইতাম তখন দেখতাম। এভাবে বহুত কিছু বুঝা যায়, দেখা যায়। অন্য একটা মানুষের চেহারা স্মরণ করলে হয়তো তার চেহারা পরিপূর্ণ ভাসে না, আমি দৃষ্টি দিলে একেবারে কালার টিভির মতো দেখতে পাই—এটাই সবচেয়ে

আত্মার খেলা। আরও কিছু আছে, যখন সাঁইজির তরফ থেকে সার্টিফিকেট পাবো তখন আরও যে কি হয় সেটা আমি জানি না। আমার ইচ্ছা আছে যে, আকাশের সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য কীভাবে জানবো—এটা আমার ইচ্ছা আছে।

মরিয়মের এইরকম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মেই নয়, অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। কিন্তু বিশেষ করে ইসলামে সাধকের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় 'ইশরাক'। বিভিন্ন স্তরের সাধনা অতিক্রম করে অবশেষে আল্লাহ্‌র সঙ্গে এক হওয়া।

আমি অন্য এক মাজারের সাধকের কাছে শুনেছি যে, এরকম জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা বিশেষ কিছু নয়, যে কোনো লোকের হতে পারে। যেমন, কেউ নিয়মিত রোজ ধ্যানের অভ্যাস করে, সঠিকমতো ধ্যামে মগ্ন হতে পারলে ক্রমশ চোখের সামনে প্রদীপের মতো ক্ষীণ আলো দেখতে পারবে। সেটা প্রথমে চোখের মায়া বা ভ্রম বলে মনে হতে পারে এবং আলোটাও দূরে ছোট্ট করে দেখা যাবে, কিন্তু ক্রমশ সাধনা করে গেলে সেই ছোট্ট আলো ক্রমশ সূর্যের আলোর মতো উজ্জ্বল মনে হবে, আর হঠাৎ সেই আলো নিজের শরীর ভেদ করে নিজের ভেতর ঢোকার মতো একটা চরম অভিজ্ঞতা হয়।

বাংলার সাধকগণ যাকে 'মারফত' বলে সম্বোধন করছেন, সেই আধ্যাত্মিক জগতের দর্শন সাধারণ লোকের জীবনযাপনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে, কিন্তু তারা

লেখক মাসাহিকো তোগাওয়ার সঙ্গে সাইমন জাকারিয়া ও সংগীতশিল্পী রবিউল হক

চিনতে বা বুঝতে পারে না। কিন্তু ধ্যানের মাধ্যমে দূরে যে ক্ষীণ প্রদীপের মতো আলো দেখা যায়, সেটা যেন আধ্যাত্মিক জগতের প্রবেশদ্বারকে ইঙ্গিত করছে। সাধকগণ ক্রমশ সেই আলোর টানে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে এক হন। এই অভিজ্ঞতাকে 'নূরালিনূর' (আলোর মধ্যের আলো) বলা হয়।

মরিয়ম তাঁর অলৌকিক উজ্জ্বল জ্যোতির সঙ্গে এক হবার অভিজ্ঞতাকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন।

বেগমের উক্তি-৩

এমন একটা জিনিস দেখছি—ওই যে বলেছিলাম না রাত্রে দেখলাম একটা লোক—আমি ওর কাছে যাওয়ার পরে দেখলাম যে, চিটাগাংয়ের হুজুরে আইসা ওর সাথে হাত মিলাইছে। বললাম না?

ওর কাছ থেকে শিখলাম। ও আবার শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অনুসারী।

তখন আমি যে গুরু বর্জ্জখ নিয়া থাকতাম—গুরুর ধ্যানে থাকতাম, ওই ধ্যান কাইটে শুধু ওই লোকের ছবিটা আসে সামনে, যখন আসে তখন আমি সেজদায় গিয়া ধ্যানে গিয়া আস্তে আস্তে জিকির আরম্ভ করলাম। দেখলাম। আমার চোখ বন্ধ কিন্তু বিদ্যুতের মতো বিজলির মতো ফস্যা হয়ে গেলো, ফস্যা হইয়া ওর ছবিটা আমার সামনে এসে লাগলো—আমি কিন্তু চোখ বন্ধ করে তাকালাম, দেখলাম—ওর শার্ট আমার গায়ে, আমার কিছু নাই। তখন ওখান থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, আলিমুল গায়েবির সাথে মিশতে গেলে মানুষের কি হাল বা অবস্থা হয়।

বহুত কিছু দেখতাম। হঠাৎ করে দুমদুম করে আওয়াজ হতো রাত্র এলে। আবার আরেক দিন দেখেছি—কী যেন একটা কালো আমার সামনে আ'সে বসলো, ব'সে ফট করে একটা আওয়াজ দিয়ে চলে গেলো।

এ রকম অনেক কিছু দেখেছি।

মাজারে মরিয়মের এইরকম অভিজ্ঞতা হওয়ার পর তিনি ঘর সংসার পরিবার ছেড়ে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মাজারে তীর্থযাত্রায় রওনা দিলেন।